নারীর প্রতি সহিংসতা ও পুরুষতন্ত্র : মুক্তির পথ অনুসন্ধান

এমএম কবীর মামুন

'চিৎকার করো মেয়ে দেখি কতদূর গলা যায়/ আমাদের শুধু মোমবাতি হাতে নীরব থাকার দায়।'— কথাগুলো বারবারই মনে পড়ে যায়, যখন দেখি চারদিকে প্রতিদিনই নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে। পরিবার থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাঙ্গন কিছুই বাদ যাচ্ছে না এই আগ্রাসী থাবা থেকে। ইদানিংকালে শিক্ষাঙ্গনে নিপীড়নের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুশিক্ষার্থী কেউই বাদ যাচ্ছে না যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন থেকে। কিন্তু আমরা কি নীরব হয়ে আছি? নীরবতাই আমাদের প্রতিবাদ। মাঝেমধ্যে রাস্তায় দাঁড়াই হাতে হাত ধরে অথবা মোমবাতি হাতে। তাতে কি আর এল-গেল নিপীড়কের? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের চোখ তুলে নিয়ে নিপীড়ক নিজে মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে সহিংসতার দায় তুলে দিলো সহিংসতার শিকার শিক্ষকের ওপর। আমরাও ভাবলাম তাই হবে হয়ত। নয়ত এমন ঘটনা ঘটবার তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। কী সুন্দর আমাদের যুক্তিবোধ! সমাজ যখন পুরুষতান্ত্রিক তখন হেজিমনিগুলো স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের পক্ষে থাকবে। তাই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর প্রতি সহিংসতার দায় কেবল নারীকেই নিতে হয়। যুক্তিগুলো খুবই অযৌক্তিক এবং হাস্যকর হওয়া সত্ত্বেও তা নীরবে অথবা কখনো সরবে মেনে নিয়ে নারীর ওপরেই দায় চাপিয়ে দিই আর স্বস্তিতে ঘুম যাই প্রতিদিন।

আমাদের দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা এবং প্রকোপ এতই বেশি যে তা অন্য যেকোনো দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। নারীর প্রতি সহিংসতার রূপগুলোর মধ্যে বলা যায়, খুন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন, অ্যাসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ বা নিপীড়নের হুমকি, বাল্যবিয়ে, যৌতুক, পারিবারিক সহিংসতাসহ আরো অনেকভাবেই সহিংসতার স্বীকার হতে হয় আমাদের দেশের নারীদের। বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে গত কয়েক মাসে গণমাধ্যমগুলো থেকে আমরা ধর্ষণসহ নারীর প্রতি বিভিন্ন প্রকার সহিংসতার যেসব খবর জানতে পেরেছি, তা উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এই সহিংসতা এখন মহামারির রূপ নিয়েছে। তবে এই পরিস্থিতি কখনো কম আবার কখনো তীব্র মাত্রায় আমাদের রাষ্ট্রে এবং সমাজে বিরাজিত। তা আমরা অনেক গবেষণা থেকেই দেখতে পেয়েছি।

সহিংসতার চিত্র

দক্ষিণ এশিয়ায় কিশোরী নির্যাতনের শীর্ষে বাংলাদেশ, আর সারা বিশ্বে সপ্তম; জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর গবেষণায় একরকমই তথ্য পাওয়া গেছে। ২০১৪ সালে প্রকাশিত 'হিডেন ইন প্লেইন সাইট' শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ১৯০টি দেশ থেকে এই গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় বলা হচ্ছে, স্বামী বা সঙ্গীর নিপীড়নের ক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক। আর দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সবার শীর্ষে। একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে কাছের মানুষ, বন্ধু যাই বলি না কেন সেটা হলো তার স্বামী/স্ত্রী। আর সেই সম্পর্কের জায়গাতেই সমস্যার শীর্ষে আমরা। কিন্তু কেন? বিষয়টা ভাবনার উদ্রেক নিশ্চয়ই করবে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ২০১২ সালে বাংলাদেশে প্রতি এক লাখ শিশু-কিশোরের (১৯ বছর পর্যন্ত) মধ্যে একজন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এ তো শুধু শিশু-কিশোরের হিসেব। সকল বয়সের নারীর ওপর সহিংসতার গবেষণা করলে এ হার আরো বহুগুণে বেড়ে যাবে। আবারো সেই একই প্রশ্ন : কিন্তু কেন? খবরগুলো কি আমাদের ভাবায় না? দৈনিক ইত্তেফাকে মুদ্রিত এক লেখায় এনএম নূরুল হক বলেছিলেন, বাংলাদেশে প্রতিঘণ্টায় ১ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর নারীর প্রতি সহিংসতা সার্ভে প্রতিবেদন, যা ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৮৭ ভাগ নারী জীবনের কোনো না কোনো সময় পরিবারের ভেতরেই কোনো না কোনো

সদস্যের দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন। অধিকারের এক গবেষণায় দেখা যায়, কেবল ২০০৯ সালেই ৪৫৪ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ২১১ জন পূর্ণবয়স্ক নারী আর ২৪৩ জন শিশু। নারীর প্রতি সহিংসতার অনেকগুলো ধরনের মধ্যে এই একটির দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পারি যে, এর রূপ কত ভয়াবহ। প্রতিদিন ১ দশমিক ২৪ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) কর্তৃক ২০০৭ সালে পরিচালিত বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে নামক এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রায় ৬০ ভাগ নারী বিবাহিত জীবনে তার পরিবারে স্বামী কর্তৃক শারীরিক সহিংসতার শিকার হন। ২০০৬ সালে আইসিডিডিআর,বি কর্তৃক পরিচালিত অপর এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ভাগ নারী বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক সহিংসতার শিকার হন। সহিংসতার শিকার নারীদের সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের হিসেব মতে, নারীরা যে যৌন নিপীড়নের শিকার হন তার ৭০ ভাগই ঘটে নিজেদের পরিবারের মধ্যে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনেকগুলো দেশে পরিচালিত নারীর স্বাস্থ্য ও নারীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা নামক গবেষণায় জানা যায়, 'পরিবারে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন এমন নারীদের মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ নারী এ সম্পর্কে অভিযোগ করেন'। এ সকল তথ্য এবং বর্তমান সময়ের গণমাধ্যমের খবরগুলোই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, আমাদের সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র কী ভয়াবহ? এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নারীর অবস্থা কতটা নাজুক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সহিংসতার প্রেক্ষাপট

এই এত এত সহিংসতা নিয়ে আমরা কথা বলছি। চেষ্টা করছি যাতে বন্ধ হয়। কিন্তু সহিংসতা কেন ঘটছে আর এর প্রেক্ষাপট কী তাও একটু দেখে নেয়া প্রয়োজন মনে হয়। সোজা কথায় আমরা বলি, পুরুষতন্ত্রই এই সহিংসতার কারণ। অবশ্যই এর দায় পুরুষতন্ত্রের। কিন্তু পুরুষতন্ত্র কোন কোন ফ্যাক্টরগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটু দেখে নেয়া যাক :

ক্ষমতাতন্ত্র/আধিপত্যবাদ

মানুষে মানুষে সম্পর্কটা হলো 'ক্ষমতার সম্পর্ক'। আর নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে তা শতভাগ কার্যকর। পুরুষ এখানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকভাবে প্রতিটি জায়গাতে নারীর চেয়ে ক্ষমতাবান। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষ অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার কারণে এই সহিংসতা ঘটে থাকে। পুরুষতন্ত্রের আরেক নাম হলো ক্ষমতা। এর মধ্যে দুটি বিষয় কাজ করে। একটি হলো নিজের ক্ষমতা জাহির করা আর অন্যটি হলো ক্ষমতা জাহির করে অন্যকে আরো ক্ষমতাহীনে পরিণত করা। তবে কেবল অধিকতর ক্ষমতাবান হওয়ার কারণেই যে সহিংসতা ঘটে তা নয়। আসলে পৃথিবীতে বিরাজিত এক মতবাদের অন্য মতবাদকে সহ্য করতে পারার ঘটনা বিরল। যেদিন থেকে পুরুষের হাতে ক্ষমতা, সেদিন থেকেই সহিংসতার সূত্রপাত। আর এই আধিপত্যবাদ বা ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য নারীর প্রতি হাজার বছর ধরে চাপিয়ে রাখা হয়েছে নানা নিয়ম আর শর্তের বেড়াজাল। আর নারী তা নীরবে মেনে নিয়েছে। এই মেনে নেয়ার সংস্কৃতি যতদিন অব্যাহত ছিল, ততদিন ছিল তথাকথিত 'শান্তি'! পুরুষতন্ত্র যদিও একে শান্তিই মনে করে, কিন্তু তা কি আদৌ শান্তির প্রতীক ছিল? প্রশ্ন থেকেই যায়। অন্যায়কে নীরবে মুখ বুজে সহ্য করার মধ্য দিয়ে কি আর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়? ফলে তথাকথিত শান্তির ঘরের ছাদ একদিন ভেঙে পড়বে তাই ছিল স্বাভাবিক। চাপিয়ে দেয়া নিয়মকানুনের বেড়াজাল ভাঙতে একদিন জেগে ওঠে নারীরাও। বলে ওঠে মানি না, মানব না। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। ত্বরান্বিত হতে থাকে সমাজের বিকাশপ্রক্রিয়া। তবে এই বিকাশপ্রক্রিয়াটা অত্যন্ত নির্মম হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। আধুনিক বিশ্বের আধুনিক সমাজব্যবস্থায় শত শত আধুনিক নিপীড়নের হাতিয়ার নিয়ে হাজির হয়েছে পুরুষতন্ত্র। মোটা দাগে এই সহিংসতাকে শারীরিক, মানসিক, যৌন আর অর্থনৈতিক এই চার ভাগে ভাগ করা হলেও এর ভেতরে রয়েছে হাজারো কৌশল আর ধরন। শিশুবিবাহ, যৌতুক, মারপিট, হুমকি, টিজিং, তালাক, খোরপোষ না দেয়া, বন্দিত্ব বরণে বাধ্য করা, বিক্রি করা, জোরপূর্বক যৌনকর্মে বাধ্য করা, দখলিস্বত্ব কেড়ে নেয়া, সম্পত্তি না দেয়া, ধর্ষণ, হত্যা, অ্যাসিড সহিংসতাসহ আরো অজস্র এর ধরন।

ধর্মীয় ফ্যাক্টর

নারীর প্রতি সহিংসতার পেছনে যে সকল ফ্যাক্টর কাজ করে তার মধ্যে অন্যতম হলো ধর্মীয় ফ্যাক্টর। সকল ধর্মের বিধি-বিধানগুলোর মধ্যেই নারীর দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে পর্দা নামক শিকল। নারী যাতে অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের চেয়ে শক্তিশালী না হতে পারে তার জন্য সম্পদের অধিকার দেয়া হয় নি। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেয়া হলেও তা পুরুষের তুলনায় এতটাই কম যে তা নারীর কোনো কাজে লাগে না। আবার সম্পদের যে ভাগটুকু নারী পান তার নিয়ন্ত্রণও পুরুষের হাতেই থাকে সামাজিক ফ্যাক্টরগুলোর কারণে। আবার পুঁজিতন্ত্রের আর পুরুষতন্ত্রের সাথে ধর্মগুলোর নিবিড় সম্পর্ক থাকবার কারণে আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরবর্তী সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত ধর্মগুলো পরিবারসহ সামাজিক সকল ক্ষমতার উত্তরাধিকার হিসেবে পুরুষকেই স্বীকৃতি দিয়ে গেছে। ফলে নারীর দাসত্বের জায়গাগুলো আরো পাকাপাকি হয়ে যায় সমাজে। কোথাও কোথাও দুয়েকটি উদার কথা বলা হলেও তা অন্যান্য বিধানকে অতিক্রম করে সামনে আসতে পারে নি। যে কারণে নারীনীতির কথা শুনেই এর ধারক বাহকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের আশঙ্কা এই যে, নারীর অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন ঘটলে ক্ষমতার একচ্ছত্র আধিপত্যের জায়গাটাতে ছেদ পড়তে পারে। নারীকে সম্পদের সমান ভাগ দিতে তারা কখনোই রাজি নয়। কারণ এতে নারী অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী উঠতে পারে।

পুঁজিতান্ত্রিক ফ্যাক্টর

মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে, এর শুরুতে সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সংগত কারণেই নারীই নেতৃত্ব দিতেন গোষ্ঠী-গোত্র-সমাজের। কিন্তু মানুষ যখন যাযাবর জীবন ছেড়ে সমাজ গঠন করল তখন থেকেই শুরু পুঁজির। যখন থেকে সমাজে উদ্বৃত্ত সম্পদ তৈরি হতে শুরু করল ঠিক তখনই সমাজের নেতৃত্ব কেড়ে নেয়া হলো নারীর কাছ থেকে। ক্ষমতা চলে গেল পুরুষের হাতে। তারপর বহু সহস্র বছর ধরে পুরুষতন্ত্র শক্তিশালী করেছে তার ক্ষমতার ভিত্তি। ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতিকে কাঠামো দিয়েছে নিজের ক্ষমতার পক্ষে। পুঁজি শক্তিশালী হয়েছে আর শক্তিশালী হয়েছে পুরুষতন্ত্রও। পুঁজিতন্ত্রের চরম রূপ বিশ্বায়নের যুগে পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতারও বিশ্বায়ন হয়েছে। আর নারীকে পরিণত করা হয়েছে ভোগ্য পণ্যে। নারী পরিণত হয়েছে পুঁজিতন্ত্র আর পুরুষতন্ত্রের ক্রীড়নকে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ফ্যাক্টর

পুরুষতন্ত্রের পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর কাজ করে, আর তা হলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক ফ্যাক্টর। আমাদের সংস্কৃতি হাজার বছর ধরে পুরুষতন্ত্রকে লালন করছে খুব যতনে। মূলত পুঁজিতন্ত্র আর ধর্মীয় সংস্কৃতির আধিপত্যের ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সামাজিক ফ্যাক্টর। লাখো বছর ধরে যেমন এক একটি জীবাশ্ম তৈরি হয়, তেমনি আমাদের সমাজের মধ্যেও পুরুষতন্ত্র হাজার বছর ধরে তৈরি হয়ে শক্তপোক্ত আকার ধারণ করেছে, প্রতিদিনই যা বেগবান হচ্ছে। বিপরীত স্রোত যতই শক্তিশালী হচ্ছে, পুরুষতন্ত্রও ততই সৃষ্টি করছে বাধা। ফলে জটিলতাগুলো আরো ঘনীভূত হচ্ছে। সামাজিক সংস্কৃতির শিকলগুলো নারীর চারিদিকে ছড়িয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে নারীকে। মুক্তির পথ করা হয়েছে কণ্টকাকীর্ণ। রুদ্ধ করা হয়েছে বিকাশের সকল দরজা। নারীর পোশাক, অলংকার, চেহারা, বেশ, রূপতত্ত্ব, ইত্যাদি আরো কত কিছুর মধ্যে বাঁধা হয়েছে নারীকে। ঠিক করে দেয়া হয়েছে নারীর কাজ; সে কী করবে আর কী করতে পারবে না। তাকে রান্না করতে হবে, পুতুল খেলতে হবে; কিন্তু সাইকেল চালানো যাবে না, বল খেলা যাবে না— আদেশ-নিষেধের এমন নানা বেড়াজাল। এ ছাড়াও আছে, মমতাময়ী হতে হবে, যখন তখন কাঁদতে হবে আরো কত কী! আর এই সকল নিয়ম-কানুন তৈরি করা হয়েছে শুধু নারীকে অধস্তন করে রাখবার জন্য।

মুক্তির পথ অনুসন্ধান

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রের এত এত উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে না। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার অনেক আইন তৈরি করেছে; যেমন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯,

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩), অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ (সংশোধনী ২০১০), নারীর প্রতি সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, জাতীয় নারীনীতি ২০১১, নারী নির্যাতন প্রশমনে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম, ইত্যাদি। কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না এই সহিংসতা। এক ধরনের সহিংসতা কমলে অন্য ধরনের সহিংসতা বেড়ে যাচ্ছে।

সরকারের উদ্যোগ কি সঠিক নাকি বেঠিক পথে চলছে তা ভেবে দেখার বিষয়। নইলে এত সব উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিয়ে সহিংসতার পরিমাণ দিন দিন কেন বেড়েই চলেছে? যে সকল প্রতিষ্ঠানে সহিংসতাগুলো ঘটছে তার কর্তৃপক্ষেরই-বা ভূমিকা কী? পরিবার থেকে সমাজের প্রত্যেক স্তরে যেখানে সহিংসতার ঘটনা ঘটছে তার প্রেক্ষিতে সেই পরিবার ও সমাজের মানুষের অবস্থান কোথায়? মুক্তির উপায় খুঁজতে হলে এই সকল কিছুরই বিবেচনা জরুরি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে যৌন নিপীড়ক শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বহিষ্কার করা হলো তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইনে কী ব্যবস্থা নেয়া হলো? কেন হাজারো সহিংসতাকারী মুক্তি পেয়ে যায় আদালত থেকে? কেন বিচারকার্যের সময় নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও তা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয় না? কেন পরিবার এবং সমাজের মানুষগুলো নিপীড়কের পক্ষে অবস্থান নেয়? এসব প্রশ্ন আর চিন্তার সমাধান না হলে এই সহিংসতার অবসান হওয়া কি সম্ভব? আমরা যতই নারীর ক্ষমতায়ন আর সমতায়নের কথা বলে গলা ফাটাই তাতে কি কর্ণধারদের কিছু এসে যায়? নারীর চুপি চুপি প্রতিবাদে সমাজের কি কোনো কিছু হয়?

বর্তমান আধুনিকতাকে মেনে নেয়ার সংস্কৃতি পুরুষতন্ত্রের নেই। ক্ষমতার আধার পুরুষতন্ত্র নারীর উত্থানকে মেনে নিতে পারে নি আর পারবে বলেও মনে হয় না। সিডও সনদের পূর্ণাঙ্গ অনুমোদন আজো আমাদের রাষ্ট্র দিতে পারে নি। নারীনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এখনো দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ব্যাপার। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ালেখা করেও একজন পুরুষের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে তা নির্ভর করে পুরুষের ওপরে। যে সমাজ অথবা রাষ্ট্রে এখনো মানুষ পড়ালেখা করে শুধু চাকুরি করবার জন্য, জ্ঞান অর্জনের বা মানুষ হবার জন্য নয়, সেখানে ক্ষমতাবাজির বাইরে এসে নারী-পুরুষের সমতা বা মানুষে মানুষে সমতার রাস্তা অনেক পিচ্ছিল ও কণ্টকাকীর্ণ। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন ছোট ছোট পরিসরে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক ধরনের সুপারিশ বের করেছেন। কেউ শিশুবিবাহ নিয়ে, কেউ যৌতুক নিয়ে, কেউ পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু বৃহত্তরভাবে সমন্বিত প্রচেষ্টা খুব কমই লক্ষণীয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে হলে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আর এই কর্মসূচির লক্ষ্য হতে হবে কারণগুলোর মূলোৎপাটন করা। কিন্তু কীভাবে সম্ভব এই কাজ? আমাদের বিবেচনায় এজন্য মোটা দাগে তিনটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা যায়, যেগুলোকে ধরে কাজ করলে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে :

প্রথমত প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের ক্ষয়ে যাওয়া রূপটাকেই রিপ্রেজেন্ট করে। এই ব্যবস্থায় ভালো মানুষ হয়ে ওঠার কোনো উপকরণ বিরাজিত নেই। ফলে শিক্ষা গ্রহণ করে একজন মানুষ নিজের পরিবর্তন ঘটাবে তা প্রায় অসম্ভব। আমাদের পারিবারিক শিক্ষা যেমন আমাদের নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করে, ঠিক তেমনিভাবে এমন শিক্ষার প্রচলন করতে হবে, যাতে আমরা ন্যায়-অন্যায়ের ভেদ বুঝতে পারি। নিপীড়ক হতে পারে আমার পিতা, হতে পারে ভাই, হতে পারে স্বামী অথবা অন্য কোনোভাবে পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত কেউ। তাতে তো আর তার অপরাধ কমে যায় না। অপরাধকে অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। আর তার জন্য শুধু কেরানি হয়ে ওঠবার শিক্ষা নয়, প্রয়োজন মানুষ হয়ে ওঠবার শিক্ষা। এজন্য প্রয়োজন পারিবারিক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

দ্বিতীয়ত প্রয়োজন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের। যার মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। আর এই সামাজিক পরিবর্তনই বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসবে। সামাজিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। এই আন্দোলন হবে চিন্তার আন্দোলন। সমাজের মাথায় হাজার বছর ধরে

নিপীড়নের যে সংস্কৃতি জেঁকে বসে রয়েছে, তাকে পরাস্ত করতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। যে হেজিমনির কারণে একজন পুরুষ মনে করে নারীর ওপর নির্যাতন করা তার অধিকার, যে হেজিমনির কারণে নারী মনে করে নির্যাতিত হওয়াই তার বাস্তবতা, সেই হেজিমনির পরিবর্তন হবে এই আন্দোলনের মাধ্যমে। এই আন্দোলনেও শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা। চিন্তার ওপর পুরুষতন্ত্রের যে আধিপত্য বিরাজমান, তার প্রতিচিন্তাকে শক্তিশালী করতে হবে। পুরুষ যেমন একজন মানুষ ঠিক তেমনি নারীও মানুষ। নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা জৈবিক দায়িত্ব পালন করবার কারণে শারীরিক ভিন্নতা তৈরি হয়। তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্নভাবে সক্ষম। ফলে সক্ষমতার ভিন্নতাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেই মানুষ হিসেবে তাদের প্রত্যেকের আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর সেই জায়গাকে প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে মানুষের চিন্তায়-মননে-মগজে পরিবর্তন আনা জরুরি। সাংস্কৃতিক আন্দোলন সেই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আধিপত্যবাদী পুরুষালি সংস্কৃতির আধিপত্যবাদী চরিত্রের পরিবর্তন করার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন। তবে বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনাটাও এই কাজের অন্যতম লক্ষ্য হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের জন্য নারীকে অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীকে প্রচলিত পুরুষালি রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জে অগ্রগামী হতে সহায়তা করবে।

আর তৃতীয়ত প্রয়োজন একটি বড়ো ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলনের, যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হবে নারী-পুরুষ মিলিতভাবে হাতে হাত ধরে। যে সকল মানুষ একটি ভেদমুক্ত সমাজের জন্য চিন্তা করেন, তা তিনি নারী কিংবা পুরুষ যেই হোন, সকলে মিলে একত্রে লড়তে হবে। একটি পরিপূর্ণ আন্দোলনই পারে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। সমাজবিজ্ঞানী মিশেল ফুকো বলেছিলেন, যেখানে ক্ষমতা আছে, সেখানেই প্রতিরোধ আছে। পুরুষের দীর্ঘদিনের ক্ষমতা কাঠামো এবং ক্ষমতার চর্চাকে 'না' বলাই এই সহিংসতার অন্যতম মূল কারণ। আমরা যারা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করি, তারা গৎবাঁধা লাইনের বাইরে যেতে পারি না। ক্ষতস্থানকে ভেতর থেকে উপশমের ব্যবস্থা না করে ওপরে মলম লাগাই। তিন থেকে ছয়মাস ভালো থাকে তারপর আবার আগের মতো হয়ে যায়। সেটাই স্বাভাবিক। অধিকার আদায়ের জন্য এখানে সংগ্রাম করাটা জরুরি। এই সংগ্রামে অনেকেই শত্রুশিবিরে অবস্থান নিবে। তাদের মোকাবেলা করতে হবে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটা অনেক কঠিন কাজ। এই কঠিনকে জয় করতে পারলেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এই কাজে নারীকে ভ্যানগার্ডের ভূমিকা পালন করতে হবে আর সহযোগী পরিবর্তনকামী পুরুষ থাকবে তাদের পাশে। তাহলেই এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

এই সংগ্রামে অবশ্যই প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। এই উদ্যোগটি শুধু সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণির একার উদ্যোগ হলে চলবে না। এখানে সমাজকর্মী এবং রাজনীতিকদের সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। সমাজ সংস্কার অথবা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন রাজনীতিকদের সদিচ্ছা এবং সমাজকর্মীদের প্রচেষ্টা। এই দুটোর সমন্বয় হলেই কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব আর বিলোপ করা সম্ভব নারীর প্রতি সহিংসতা নামক নোংরা অধ্যায়ের। এজন্য উদ্যোগ নিতে হবে এখনই, কারণ সহিংসতা এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

এই তিনটি ক্ষেত্র নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারলেই কেবল নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ সম্ভব। যার ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে নারী-পুরুষ সমতাপূর্ণ একটি সমাজ। এজন্য সকল সংকোচ ভেঙে এগিয়ে আসতে হবে পরিবর্তনকামীদের। কারণ, সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।

এমএম কবীর মামুন উন্নয়নকর্মী। kabirmamun78@gmail.com